নাটক ও চলচ্চিত্র

অণ মুখোপাধ্যায়

ভাবনাটা এসেছিলো 'জগন্নাথ' নাটকের প্রযোজনাকে ভিত্তি ক'রে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য ও মতামতের খাতবেয়ে। ভালো অথবা মন্দ, চলনসই অথবা দাণ--- এই ধরনের মন্তব্য শুনতেই আমরা অভ্যস্ত; জগন্নাথ সম্পর্কে যেটা বিশেষভাবে বলব ার---দর্শকদের একাংশ এবং বেশ কিছু সমালোচক তাদের ভালো লাগার উচ্ছ্বাসটা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন 'যেন সিনেমা দেখলাম।'

সিনেমা ও থিয়েটারের মিল - অমিল কোথায় বা তাদের মাধ্যমগত নিজস্বতার ব্যাপারটা ভাল করে বুঝেইযে সকলে এই ধরনের মন্তব্য করছেন তা নয়--- ভাসাভাসা একটা ধারণার ওপর ভিত্তি করেই বহুক্ষেত্রে এই সব মন্তব্য করা হয়ে থাকে। কিছু ধারণাটা ভাসাভাসা বলেই সেটা এককথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না দুটি কারণে, প্রথমত ভাসাভাসা হলেও সাধারণ দর্শকদের ক্ষেত্রে মন্তব্যকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা খুবই আন্তরিক (পণ্ডিতদের কথা অবশ্য আলাদা) আর দ্বিতীয়ত অ ামাদের অনেক ধ্যানধারণাই এইরকম ভাসাভাসা এবং তার জোরেই আর কিছু না হোক বেশ কিছুটা বাজার গরম করা য ায়। মৃণাল সেন যখন বলেন---এতদিন ধরে সিনেমা ভাঁড়ারে জমা করা কিছু অস্ত্র এ - নাটকে থিয়েটারী চালেই সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয় এবং তাতে নাটকেরই ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে--- তখন ব্যাপারটা মেনে নিতে কোন আপত্তি উঠতে পারে না--- কারণ প্রয়োজনবোধে সিনেমাও নাটকের মালমশলা ব্যবহার করে এবং তাতে সিনেমা লাভবানই হয়।

'জগন্নাথ' নাটক দেখে কেন যে 'সিনেমা দেখছি' ধারণাটা প্রশ্রয় পেল সেটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে প্রথমেই যেটা আলোচনার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেটা হচ্ছে সিনেমা আর থিয়েটারের সম্পর্কটা ঠিক কিরকম? দুটি শিল্পমাধ্যমের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি কি? সঙ্গে সঙ্গে দুটি শিল্পমাধ্যম কার থেকে কতখানি গ্রহণ করেও নিজস্বতা বজায় রাখতেপারে, এমনকি কোথায়ই বা দুটি শিল্পমাধ্যম মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়--- এই সব প্রসঙ্গ নিয়েও বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন দেখা যায়।

ওপর ওপর দেখলে চট্‌পট্‌ কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছে করে বই কি! যেমন, 'জগন্নাথ' -এর প্রস্তাবনা অংশে মঞ্চের বিভিন্ন অংশে (স্ত্রপ্সন্দ্ব) ছোট ছোট টুকরো দৃশ্য অভিনীত হয়---তখন সেগুলি সিনেমার 'শট' (ব্দড়ম্পন্ধ)-এর মত মনে হতে পারে। দৃশ্য সংস্থাপনের এমন কিছু কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে এ-প্রযোজনায় যাতে ক'রে 'ক্লোজশট' (স্তুপুম্পব্দন্দ্ব ব্দড়ম্পন্ধ) অথবা 'লং শট' 'লং শট' (প্তম্সন্ধ ব্দড়ম্পন্ধ)-এর কথাও মনে আসতে পারে---চকিতে কোন মুহূর্তে তৈরী হয়েই মিলিয়ে গেল এবং তার ঘাড়ে অন্য একটাদৃশ্য এসে পড়লো---দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার স্বচ্ছন্দ প্রবাহ---এগিয়ে পিছিয়ে যাওয়া---এইসব আঙ্গিকের বর্ণনাপ্রসঙ্গে সিনেমার প্রচলিত শব্দগুলি, যেমন 'জাম্প কাট' (গ্নত্তপ্পন্দ্ম স্তুত্তব্ধ), 'ফ্ল্যাশ ব্যাক' (ন্দ্রপ্তব্দড়ত্রস্তুন্স) অথবা 'ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড (ন্দ্রপ্তব্দড় ন্দ্রম্সজ্ঞভ্রজ্ঞস্তু), এমন কি 'মনটাজ' (প্পম্সব্ধব্ধন্দ্ব), মনে উঁকিঝুঁকি মারতে পারে! বাস্তব থেকে কল্পনার জগতে অনায়াস প্রবেশ অথবা শুধুমাত্র ভাবনার দৃশ্যগুলির প্রশংসা করতে গিয়েও কেউ সিনেমার 'ড্রিম সিকোয়েন্স' (স্তুজ্ঞন্দ্বপ্প ব্দন্দ্বশুত্তন্দ্বস্তুন্দ) অথবা 'ফ্যান্টাসী' (ন্দ্রব্ধব্ধব্দস্ত)-র কথা তুলতে পারেন। এ-ন াটকে ব্যবহৃত শব্দ ও সংগীতের অনুষঙ্গ প্রসঙ্গেও অনেকেই সিনেমার ছোঁয়া আবিষ্কার করেছেন।

কিন্তু মুস্কিলটা হোল শব্দ যাই ব্যবহার করা হোক না কেন বিষয়গুলি যেমন সিনেমার একচেটিয়া ছিলো না --- ভঙ্গীগুলিও সিনেমার একচেটিয়া বলে মনে করার কোন কারণ দেখি না। ওপরে যা যা বলা হোল তার প্রায় সবকি ছুই দেশে - বিদেশে বহু প্রযোজনায় বিক্ষিপ্তভাবে বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু সমন্বয় হয়নি---কিংবা বলা চলে, এদেশে একটিপ্রযোজনার মধ্যে এত বেশী

ক'রে এই কৌশলগুলি কাজে লাগানো হয়নি--কিন্তু তাতে কি সত্যিই কিছু আসে যায়? নাটকটির থিম্ (ঋড়ন্দ্বপ্নন্দ্ব) -এর সঙ্গে এই ভঙ্গীর ভাল মিশেল হয়েছে বলেই দর্শকরা তাদের বাড়তি ভালোলাগাটুকু পছন্দসই বিশেষণে ভূষিত করতে না পেরে সিনেমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন?

একটু বিশ্লেষণ করলেই বুঝে নিতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে প্রয়োজনাটির সামগ্রিক পরিকল্পনা মঞ্চবাস্তবতার চৌহদ্দীতেই করা হয়েছে। 'প্রসেনিয়ম' (ত্নক্তজ্ঞব্দন্দ্রুন্তুপ্প) মঞ্চের ঘেরাটোপেই নাটকের সমস্ত কর্মকাণ্ড ঘটছে---মঞ্চের ভাষাতেই সব কিছু করার সচেতন প্রচেষ্টা হয়েছে। নাটকে ক্যামেরা - প্রজেকটর - স্লাইড - পর্দা ইত্যাদিরকোন ব্যবহার নেই। মঞ্চসজ্জাও বাস্তবঘেঁষা নয়। ঘরের জানলা - দরজার ফ্রেমই আছে শুধু --- এমনকি ঘরের দেওয়ালও নেই। যেটা মন্দিরের চাতাল সেটাই আদালত কক্ষ--- আবার সেটাই ফাঁসীর মঞ্চ! বাস্তবে হাঁড়িকাঠ পোঁতা থাকে মাটিতে--- মঞ্চে রাখা বেশ খানিকটা উঁচুতে চাতালের ওপর যাতে সবসময় হাঁড়িকাঠটি দর্শকদের চোখে পড়ে।থিয়েটারের 'লজিক' এসব কিছুই বরদাস্ত করে---এটাই 'ঋড়ন্দ্বব্ধজ্জনন্তুপ্তন্দ্বস্তু' (অনাবশ্যক নাটকীয় আড়ম্বর অথবা ভাবাবেগের প্রাচুর্য নয়) এবং এই সমস্ত আপাত অবাস্তব আঙ্গিকের সাহায্যেই থিয়েটার বাস্তবকে ধরার চেষ্টা করে, সত্যকে ছোঁয়ার প্রয়াস পায়। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও যে 'ব্দব্ধন্তুপ্তন্দ্বন্দ্বস্তু' ভঙ্গী --- আলোর ব্যবহারেও বাস্তবতার সীমাকে ছাড়িয়ে গিয়ে যে অন্যতর ব্যঞ্জনা আনার চেষ্টা তাও থিয়েটারে বেশ মাননসই। মঞ্চের একজায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁধে মোড়া নিয়ে শুধু কতগুলি 'স্তুস্তুন্তু প্পস্প্লন্দ্বপ্নন্দ্রুব্ধ' এবং মুদ্রা ব্যবহার করে এক গাঁ পেরিয়ে অন্য গাঁয়ে পৌঁছে যায়--- সিনেমার মত মাঠ - ঘাট - আলে'রপথ আর নদীর পাড় -এর 'শট' (ব্দড়ন্সব্ধ) দেখিয়ে বোঝাতে হয় না। হাতে 'রিভলবার' ধরার সঙ্গে সঙ্গেই যখন আলোর রংটা বদলে যায় থিয়েটারের দর্শক এ-প্রশ্ন তোলেন না -- রাতের বেলা অমন উজ্জ্বল 'র্প্লন্ধক্ত' আলো কোন ব্দপ্সত্তুজন্তুন্দ্ব থেকে এলো। এ সবই থিয়েটারের 'স্তুপ্স্ক্লন্দ্রুব্ধনপ্স' ---এমনকি ভাবনার দৃশ্যে ছোটবেলার ফিরে যেতে চরিত্রের পোষাক - আষাক বদলাবারও প্রয়োজন হয় না--- অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরও প্রয়োজন হয় না---- আলো এবং সংগীতের সুষ্ঠু ব্যবহারে অভিনয় ভঙ্গীর বৈচিত্র্যে মুহূর্তের মধ্যেই এই কালভেদ ঘটানো সম্ভব। অথচ মজার ব্যাপারটা হোল এই, বহু দর্শক ঠিক এই ধরনের ব্দন্দ্বশুত্তন্দ্রুন্তুন্দ্ব - গুলিকেই 'সিনেমাটিক' বলে প্রশংসা করেছেন। চলচিচত্রে এই ব্দন্দ্বশুত্তন্দ্রুন্তুন্দ্ব -এর দৃশ্যবিভাগ কেমনটি হবে সেটা এখানে আলোচনার বিষয় নয়, তবে এরকমটি যে হবে না অথবা এরকমটি হলে যে সেটা 'সিনেমা' হবে না সেটাবোধহয় নিশ্চিত করেই বলা যায়।

এ কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রায় আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই 'সিনেমা' তার ক্ষমতা জাহির করেছে---সবাক হবার পর থেকেই তার দাপট ক্রমশ বেড়েছে এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেও তার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাতে পেরেছে। প্রমোদ - মাধ্যম হিসেবে সিনেমার যে - জৌলুষ তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে থিয়েটার। কিন্তু এই অসম প্রতিযোগিতার দরকারও ছিলো না---যে যার নিজের কথা বলেই নিজস্বকৌশলেই দর্শকদের আলাদাভবে টানার ক্ষমতা রাখতে। জীবনধর্মী শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে দুটি শিল্পমাধ্যমেরই প্রয়োজন আছে---নিজস্ব পদ্ধতিতে, নিজস্ব প্রক্রিয়াতেই তারা তাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে--- জীবন তথা বাস্তবতার গভীর থেকে গভীরতর স্তরকে ছোঁয়ার যে-প্রচেষ্টা সব শিল্পের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় তাতে এ-দুটি জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যমের শরিকানা আছে। তবে আলাদা শিল্পমাধ্যম হিসাবে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কার বেশী এ নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই--- কিন্তু এই বিতর্কের জের টানতে গিয়ে আমরা অনেকসময়ই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে ঢুকে পড়ি এবং এলোমেলো মন্তব্য করে বসি। তখন কে কতখানি তার শুদ্ধতা বজায় রাখতে পারছে, কে কার থেকে কতখানি খাবলে নিচ্ছে --- কার অঙ্গে কোন ভূষণ ঠিকমতন মানাচ্ছে ইত্যাকার প্রশ্ন তুলে আমরা সমগ্র বিষয়টিকে জটিল করে তুলি; একটি মাধ্যমের প্রশংসা করতে গিয়ে অন্যটিকে হেয় ক'রে বসি এবং তার ফলে দুটি মাধ্যমের কোনটির প্রতিই সুবিচার করতে পারি না।

একটা কথা আমরা ভুলে যাই যে--- শিল্পকলার সাম্রাজ্য ঠিক সেই ভৌগোলিক সীমারেখা নিয়মে চিহিত করা যায় না -- সেখানে একে অন্যের এলাকায় পা রাখলেই সেটা অনুপ্রবেশ বলে ধরে নেওয়া হয় এবং তার ফলে সংঘর্ষ ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়--এখানে একে অন্যের এলাকায় স্বচ্ছন্দে ঢুকে পড়তে পারে --- অন্যের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ না করেও অবাধে বিচরণ করতে পারে -- সবটাই অবশ্য শিল্পের লক্ষ্যপূরণের জন্য অথবা জীবনের তাগিদে। যে শিল্পীমানস জীবনকে ছুঁতে চাইছে-- বাস্তব সত্যটাকে খুঁজে চাইছে, যে কোন মাধ্যমেই তার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া চলতে থাকুক না কেন কোন একটা বাঁধ

াধরা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে ধরাও যাবে না---- বিশেষ মাধ্যমের কারাগারে তাকেবন্দীও করে রাখা যাবে না। আকাশ - পাতাল তোলপাড় করেই সে তার শিল্প - জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজবে --- সব সীমারেখা তছনছ করেই সে তার অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে চাইবে। তবে একথা বলাই বাহুল্য এক একটি মাধ্যমের হাতিয়ার যেহেতু এক এক রকম, সৃষ্টি প্রত্রিয়াতেও সে অনুযায়ী রকমফের হতে বাধ্য।

কতকগুলি মোদ্দা ধারণা আর তার সরলীকৃত প্রয়োগ অনেকসময় অবাঞ্ছিত জটিলতার সৃষ্টি করে। যেমন ধরা যাক্--- একটি চলচিচত্রের নিন্দা করতে গিয়ে কোনো সমালোচক লিখলেন 'নাটক হয়েছে, স্রেফ নাটক' নাটক নিশ্চয়ই এখানে ব্যাঙ্গার্থে ব্যবহৃত অথচ এই ধরনের মন্তব্যে না ঠিকমত বোঝান যায় চরিত্র না দেখান হয় অন্য একটি শিল্পমাধ্যমের প্রতি যথোচিত সম্মান। শুধুমাত্র যদি ন্দ্রপ্সক্তপ্প -এর তফাৎ -এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সমালোচক এই মন্তব্যের দ্বারা সিনেমার নিজস্ব ভাষার অভাবটাকেই সূচিত করতে চাইতেন তাহলেও বা বোঝা যেত --- কিন্তু 'নাটক' অর্থে তিনি নিশ্চয়ই ভাবাবেগের বাড়তি উচ্ছ্বাস--- স্বাভাবিকতার অভাব অর্থাৎ সাজানো কৃত্রিম নাটকীয়তার ব্যাপারটাই বোঝাতে চাইতেন--- এবং সেগুলিকেই চলচিচত্রটির ব্যর্থতা হিসাবে চিহিত করতে চাইতেন। আবার কোন নাটকের মধ্যে প্রয়োজনা আঙ্গিকে অথবা অভিনয় ভঙ্গীতেএকটু বাড়তি আবেগ লক্ষ্য করলেই অনেককে বলতে শুনি 'এ তো নাটক হোল না--যাত্রা হলো!' তাহলে কি মানেটাএইরকম দাঁড়ায়, ভাবাবেগের মাত্রা অনুযায়ী মাধ্যমগুলির চরিত্র চিহিত হবে? অর্থাৎ খুব বাড়াবাড়ি হলে 'যাত্রা',মাঝারি গোছের হলে 'নাটক' আর একেবারে সহজ স্বাভাবিক রূপটি শুধুমাত্র 'সিনেমা'রই চরিত্রলক্ষণ। অর্থাৎ নাটকএকটু মোটা দাগের ব্যাপার, সিনেমা, তার চেয়ে অনেক উন্নত অথবা সূক্ষ্ম শিল্পমাধ্যম। ঠিক সেইজন্যই বোধহয় নাটককে সিনেমা বললে তার খুব প্রশংসা করা হয় অর্থাৎ সে জাতে উঠলো---এমন একটা অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রশ্রয় পায়।

এই ধরনের সাপ্টা মন্তব্যে স্পষ্ট ক'রে কিছুই বোঝান যায় না। কারণ 'নাটক' এবং 'নাটকীয়তা' কথা দুটি সমান অর্থ বহন করে না--- 'নাট্যত্রিয়া' এবং 'নাটকীয়তা' কথা দুটির মধ্যেও অনেক তফাৎ আছে। বাড়তি নাটকীয়তা যে কোন শিল্পের স্বাস্থ্যের পক্ষেই ক্ষতিকর। মাধ্যম অনুযায়ী তার প্রয়োগ ও প্রকাশরীতিতে রকমফের ঘটে সেটুকু মাথায় রাখলে আর একের দোষগুণ বোঝাতে অন্যকে নিয়ে টানাটানি করতে হয় না। একটি মাধ্যমে যেটা স্বাভাবিক এবং খুবই মানানসই--হুবহু সেইভাবেই তাকে অন্য মাধ্যমে ব্যবহার করতে গেলে গোলমাল বাঁধতে পারে বইকি? কোন যাত্রাপালায় ভাষার আড়ম্বর আর অভিনয়ের দাপটটা বেশী সেটা ঠিকমত বুঝতে হলে যাত্রার কর্মক্ষেত্র, দর্শককুলের মানসিকতার প্রসঙ্গগুলি স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। কিন্তু তাই বলে নাটকীয়তা বা 'স্তব্জ্রপ্পব্ধনন্ত ন্দ্বপ্তন্দ্বপ্পন্দ্ধব্ধ' টা তো পুরোপুরি বরবাদ করে দেওয়া যেতে পারে না। অনেক ভালো ছবিতে এমন অনেক নাটকীয় মুহূর্ত থাকে যা একইসঙ্গে শিল্পশোভন বটে আবার সেই ছবির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণও বটে। আবার এমন নাটকেরও অভাব নেই যার মধ্যে তথাকথিত নাটকীয়তার খুবই অভাব--- অন্তর্লীন নাট্যত্রিয়ায় সে নাটকের মেজাজ খুবই ঠাণ্ডা। নাটকে অথবা চলচিচত্রে কেউ নিটোল গল্প বলতে ভালবাসেন--- কেউ টুকরো ন্দ্বন্মানব্দপ্সস্তুন্দ্ব -এর সংঘাতে অন্যতর বত্তব্যের সন্ধান করেন---কারো মেজাজ ধীর স্থির---কারো মেজাজ চড়া, সবই নির্ভর করে সৃষ্টিকর্তার মুর্জি এবং মাধ্যমটিকে ব্যবহার করতে জানার ওপর। ফাঁপানো আবেগ, সাজানো নাটকীয়তা এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্করহিত যে কোন শিল্পপ্রয়াসেই বাস্তবতার দাবীকে উপেক্ষা করে--- হাল্কা প্রমোদ - বিতরণের প্রয়াস শিল্পকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করার ব্যবসায়িক মনোভাব থেকেই আসে---উৎকৃষ্ট শিল্পরস পরিবেশনে অপারগ হলে, শিল্পমাধ্যম অথবা জীবন --- কারো প্রতি দায়িত্ব পালন করাই তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। অর্থাৎ সেইদিক থেকে দেখলে বাড়তি নাটকীয়তা অথবা ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস শুধু সিনেমার পক্ষেই নয় নাটকের পক্ষে এমনকি যে কোন জীবনবাদী শিল্পের পক্ষেই সমান দোষের।

এ-কথা তো সবারই জানা, প্রথম দিকে চলচিচত্রকে প্রায় পুরোপুরিই নাটকের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে---গল্পের কাঠামো---সংলাপের ধরন---অভিনয়ের ভঙ্গী সব কিছুই নাটকের আদলে---তারপর থেকে যতই সে নিজের শক্তিকে বুঝে উঠতে শিখলো ততই সে নিজের ভাষার জোরে সবাইকে ঠেলে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চালালো। নাটকের ইতিহাসটা কিন্তু অনেক প্রাচীন। আর প্রাচীন বলেই সময়ের বিবর্তনে তার ভাষা এবং ভঙ্গীর এতরকম আদল--বদল হয়েছে যে থিয়েটারের আদিম ভাষাটা ঠিক কি এটা নিয়েও গবেষণার অন্ত নেই। চলচিচত্রের ক্ষেত্রে যেমন কেউ কেউ মনে করেন, নির্বাক যুগে

ফিরে যাওয়াতেই বোধ হয় চলচিচত্রের মুক্তি --- কথা বা সংলাপকে বাতিল করে শুধুমাত্র শব্দ ও সংগীতকে ব্যবহার করে এবং চিত্রকল্পের ওপর জোর দেওয়াটাই চলচিচত্রের ধর্ম এবং বিমূর্ততাই তার অভীষ্ট লক্ষ--- নাটকের ক্ষেত্রেও গুজ্জপ্সব্ধপ্সভ্রব্দপ্সন যে-পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচেছন এবং যার প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানান ধরনের কাজও চলছে সেখানেও থিয়েটারকে সবরকম অঙ্গিকের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার অভিযান শু হয়ে গেছে। সাহিত্য বা সংলাপের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার সাধনা যেমন চলচিচত্রের, থিয়েটারেও সেই একই ধারায় কাজ চলছে। অর্থাৎ থিয়েটারও সেইদিক থেকে বিমূর্ত হওয়ার লক্ষে ধাবিত হতে চাইছে---নানারকম 'মুদ্রা' ---অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র---শারীরত্রিয়া এবং কন্ঠস্বরের কলাকৌশলে মানবজীবনের সবরকম অভিজ্ঞতাকে ধরার চেষ্টা চলছে। কিন্তু অন্য মতও তো সমান প্রবল, 'ন্তুন্দ্বপ্পন্ধ নব্দত্রব্দ প্পত্তন্তড়ত্রত্তজ্জ্বপ্তত্রব্দ্লনব্দত্ত্বপ্ত' এ- মতের জোরালো মদত্দার আছেন অনেকেই। লিখিত শব্দই যেহেতু সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ--- যেহেতু ভাষা সাহিত্যের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। কিন্তু তাই বলে ভাষা বা সংলাপ ব্যবহার করলেই সেটা সাহিত্যের ওপর নির্ভরতা হয়ে গেল এটা তো পুরোপুরি মেনে নেওয়া চলে না। ব্রেষ্ট তাঁর নাটকে ভাষা নিয়ে অনেকরকম পরীক্ষা করেছেন---এবং ত্নপ্সব্দব্ধন্দ্বজ্ঞ ইত্যাদি ব্যবহার করে স্লাইড ব্যবহার করে---ভাষা এবং ছবি অথবা নাটকের চরিত্রের সংলাপ এবং ত্নপ্সব্দব্ধন্দ্বজ্ঞ ও লেখা কথার মধ্যে একটা ন্তুপ্সব্ধজ্জ্বস্তুনন্তুব্ধনপ্স তৈরী ক'রে একটা স্তুন্ত্রপ্তন্দ্বন্তুব্ধনন্তুব্দ তৈরী করে সমস্ত ব্যাপারটিতে নতুন ব্যঞ্জনা আনা সম্ভব---সাহিত্য ওই একই কাজ অন্য পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে চাইবে--- এবং সিনেমাও অন্য আর এক পদ্ধতিতে সেই কাজটা সারবে। এদেশে মৃণাল সেনের ছবিতে এবং বিদেশে গোদারের ছবিতে এধরনের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সংলাপ তো একটি জোরালো অস্ত্র। প্রতিটি মাধ্যমের একটা প্রধান অবলম্বন থাকেই---একটা 'মাতৃভাষা' থাকেই---কিন্তু অন্য মাধ্যমের সঙ্গেও তার অনবরতই আদান- প্রদান চলতে থাকে--- অন্য মাধ্যমের ভাষা বা আঙ্গিক তার মাতৃভাষার সম্পদকে সমৃদ্ধ করে--- অবশ্য যিনি নিজের মাতৃভাষাটাই ভাল করে শেখেননি--- নিজ মাধ্যমটিকেই যিনি ভাল করে বোঝেননি--- তার কাছে 'অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত'!

আমি নিজে যেহেতু ছবি পরিচালনা করার সুযোগ পাইনি তাই পরিচালনা বিষয়ে দুটি মাধ্যমের বিশিষ্টতানিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়---কিন্তু ভাল ছবি দেখে, সামান্য কিছু পড়াশোনা ক'রে এবং মৃণাল সেনেরএকটি ছবির নির্মাণকর্মে আগাগোড়া যুক্ত থাকার ফলে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমার যে ধারণা হয়েছে তাতে ভরসা করে বলতে পারি--- একটি ভাষা যিনি ভাল বোঝেন, অন্য ভাষার ধরনধারণও তার পক্ষে বোঝা অনেক সহজ কোনটা তার নিজস্ব ভাষা এটা বুঝতে গেলেই কোনটা তার ভাষা নয় এই বোঝাটাও জরী হয়ে পড়ে। সাহিত্যের মধ্যে তো উপন্যাস - ছোটগল্প - নাটক - কবিতা - প্রবন্ধ- রম্যরচনা কত শ্রেণীবিভাগ--- আলাদা নাম আলাদা ভঙ্গী--- তাদের মধ্যেও নিত্য ঠোকাঠুকি হচেছ আবার কোলাকুলি হচেছ।

'ড্রস্তুনব্ধন্দ্ধ ব্ধত্ত্বন্দ্ব' -এই নাকি চলচিচত্রের জন্ম হয়---এটা একটা মত। কিন্তু সিনেমার 'ব্দড়প্সপ্সব্ধন্দ্ধ' পর্বেও যে সৃষ্টিপ্রত্রিয়ার অনেকখানি কাজ সম্পন্ন করে নিতে হয় সেটা তো মিথ্যে নয়---একেবারে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে তোলা এলোমেলো জ্ব্তব্দড় থেকে সত্যিকারের অর্থবহ ছবি করা কি সম্ভব? অবশ্য ব্দড়প্সপ্সব্ধন্দ্ধ করার পরে ন্দ্বস্তুনব্ধন্দ্ধ -এর সময়ে চিন্তাভাবনার অদলবদল করার সুযোগ থাকেই এবং বিভিন্ন ব্দড়প্সব্ধ সাজানোর কারসাজিতে নতুনতর ব্যঞ্জনা আনাও সম্ভব হয়---শব্দ ও আবহসংগীতের সাহায্যেও আবার নতুনতর ব্যঞ্জনা আনা সম্ভব--- কিন্তু এসব কিছুরই একটা পূর্বপরিকল্পিত ছক থাকে---চিত্রনাট্য লেখার সময় থেকেই সেই ছকটিঠিক করে নিতে হয়--- তারপর কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে তার সংশোধন এবং সংযোজনের কাজটা চলতেই থাকে। এই একই নিয়ম বেশি খাটাতে গেলে বিপদ আছে বইকি। শব্দ সংযোজনার সময়ও এমন অনেক নতুন দিক উন্মোচিতহতে পারে---অর্থাৎ ছবি তোলার সময় পরিচালকের যে-মনোভাব কাজ করছে ছবি দেখে অথবা শব্দ শুনে যদি কোন নতুন ভাবনার উদয় হয় এবং সেটিকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারেন তাহলে অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যেতেই পারে---তবে মূল খসড়া কিন্তু সেই চিত্রনাট্য রচনার সময় থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

নাটকের ক্ষেত্রেও প্রায় একইরকম ভাবে ঘটে---যদিও পদ্ধতিটা একেবারেই আলাদা। নাটকের ক্ষেত্রে সংলাপই যদিই ধরা হয় ব্দড়প্সপ্সব্ধন্দ্ধ -পর্ব এবং শেষ দিকের পূর্ণ মহলাগুলি যদি হয় প্পপ্সুনব্ধপ্সজ্ঞ এবং প্রথম রজনী হয় ন্দ্রন্ত্রপ্ত ব্ধত্ত্বসন্দ্ব তারপরেও কিছু অদলবদল করে, অভিনয়ে শব্দ ও সংগীতের ব্যবহারে অথবা আলো ও সাজসজ্জার ব্যবহারে নতুনতর ম

াত্রা যোজনা করার সুযোগ থেকেই যায়। এবং অনেকদিন পর্যন্তই থাকে। এখন থিয়েটারে 'আবহ - সংগীত' -এর একটা খসড়া করে আলাদাভাবে জন্দ্বক্তপ্সজস্ত করা হয়----নাটকের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে অনেকসময়ই অনেককিছু বাদ দিতে হয় (আমাদের একটি নাটকের 'আবহ- সংগীতে'র জন্দ্বক্তপ্সজস্ত করা প্রায় পুরো অংশটাই পরে বর্জন করতে হয়েছিল নাটকের মূল ব্ধড়ন্দ্বপ্পন্দ্ব -এর সঙ্গে কিছুতেই মিশ খাচ্ছিল না বলে)---তখন আবার নতুন ভাবনার উদয় হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সংযোজনও করা যেতে পারে। নাটকের স্তুপ্সপ্পন্মপ্সব্দন্ব্ধনপ্স স্তুড়প্সজন্দ্বপ্সন্ধস্তুন্মড়স্তু, দৃশ্যবিভাগ, মঞ্চসজ্জা, আলোক - পরিকল্পনা এবং সর্বক্ষেত্রেই এই অদলবদল করার সুযোগ থিয়েটারেও আছে---হয়তো একটু বেশী মাত্রায়ই আছে। বদলাতে বদলাতে একটা নাটক একেবারে আমূল বদলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত কম নয়। আরও একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা করলে কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। সিনেমার হাতিয়ার যেমন ক্যামেরা,থিয়েটারের হাতিয়ার কি? নিশ্চয়ই অভিনেতা। অন্যদিক দিয়েও প্রশ্নটি তোলা যায় সিনেমার অবলম্বন 'ছবি', তাহলে থিয়েটারের অবলম্বন কি? সংলাপ? উচচারিত ভাষা? কিন্তু এত সহজ সরলভাবে জবাব খুঁজতে গেলেই মুস্কিল আছে। ক্যামেরা দিয়ে যদি 'ছবি তোলা হয় থিয়েটারের মত সিনেমাতেও অভিনেতাকে দিয়েই অনেক গুত্বপূর্ণ কাজ করিয়ে নিতে হয়। যদিও বস্তু এবং পটভূমির গুত্ব সিনেমাতে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী --- পর্দাতে বহুগুণ বাড়িয়ে ছবি দেখান সম্ভব বলেই খুঁটিনাটি বিষয় তুলে ধরা এবং বস্তুর প্রতীকী ব্যবহারের সুযোগটা যেখানে অনেক বেশী--- কিন্তু 'দৃশ্যধর্মিতাই' সিনেমার স্বধর্ম বলে ঘোষণা করলে অনেক বিপদ দেখা দেয়--- অন্যদিকে থিয়েটারে শোনার ব্যাপারটাই প্রধান এ-ধারণাটাও অবৈজ্ঞানিক--- কারণ আমাদের সংস্কৃতিতে থিয়েটারের নাম 'দৃশ্যকাব্য' এবং দেখার ব্যাপারটা থিয়েটার কম গুত্বপূর্ণ নয় এটা আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা। পাশাপাশি যে-প্রশ্নগুলি আসে--সিনেমা না হয় সাহিত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য অনেকদিন ধরেই ছটফট করেছে কিন্তু 'চিত্রকলা' - 'সংগীত''ভাস্কর্য' ইত্যাদির ওপর তাকে নির্ভর করতেই হয়, কথা কমিয়ে ভঙ্গী অথবা মুদ্রার ওপর বেশী নির্ভর করলেও 'নৃত্যে'র ওপর নির্ভরশীলতা বাড়তে পারে। থিয়েটারও যখন সাহিত্য বা সংলাপের নির্ভরতা থেকে মুক্ত হবার বাসনায় 'ম্নড়ভ্ধনন্তুপ্তএন্তুব্ধনন্ধ' অথবা 'মুদ্রা'র ওপর বেশী নির্ভর করতে চায়--- অর্থবহ সংলাপ না বলে শুধুমাত্র 'ধবনি'র ওপর বেশী গুত্ব দিতে চায় তখন মনে হয় যেন সে যেন সেই আদিম যুগের মানুষের ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীটাকেই ধরতে চাইছে। কিন্তু সভ্যতাযতদূর এগিয়ে এসেছে তাতে ভাবপ্রকাশের বিশুদ্ধ উপায় হিসাবে ওই ভাষার ক্ষমতা মেনে নিয়েও বলা চলে ওইভাবে আবার পেছনে ফিরে যাওয়া হয়তো সম্ভব নয়। তবে পরীক্ষা - নিরীক্ষা চলতে পারে -- আজকেও বুদ্ধি ও মনন দিয়ে হয়তো মানুষ নতুন কোনো ভাষাও তৈরী করে নিতে পারে। উৎসে ফিরে যাওয়ার তাগিদটা যতই আন্তরিক হোক--- 'বিমূর্ততাই শিল্পের 'অন্বিষ্ট' এ-মত যত জোরালো সমর্থনই পাক--- কোন বিশেষ গণ্ডীতে এই দুটিশিল্পমাধ্যমের কোনটিকেই বেঁধে ফেলা আর সম্ভব নয়---নানা পথে নানান দিকে তারা নিজেকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেই আবার সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব ভাষা এবং চরিত্র রাখার প্রয়াসও চালিয়ে যাবে।

ক্যামেরার চোখ খুবই শক্তিশালী, ছবি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ক্যামেরার প্পপ্সন্তুপ্তন্ব্ধন্ত ও অনেক বেশী। এই ঘর---এই পাহাড়--- এই সমুদ্র---এই জীর্ণ কুঁড়েঘর--- এই বিশাল অট্টালিকা মুহূর্তে মুহূর্তে ছবি পালটে যায়--- অন্যদিকে থিয়েটারে যা কিছু দেখাতে হবে তা ওই স্তুপ্র — ব্দব্ধন্ধন্দ -এর ঘেরাটোপের মধ্যেই। কিন্তু সেটা কি সত্যিকারের কোন সমস্যা? চিত্রকার তো তাঁর ছবির ফ্রেমে গোটা ব্বিকেই ধরতে পারেন---ব্রন্ধপ্তব্দ'-এর পাতায় তো অথবা গ্লোবের পরিধিতে তো ব্বি গুটিয়ে এতটুকু হয়ে আসে। তাছাড়া আরও একটা বড় প্রশ্ন আছে। যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে তার সবটুকুই তো আমরা দেখি না--- অথবা আরও একটু এগিয়ে বলা যায় আমাদের চোখ যা দেখে (বা সিনেমাতে ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তুলে যা দেখান হয়) সেটাই তো সত্য নয়! অথচ স্বাভাবিকতার প্রতিভাস বলে মনে করানোর একটা সহজাত ক্ষমতা চলচিচত্রের আছে বলেই মানুষকে ঠকানো অথবা সত্যকে লুকিয়ে রাখার ক্ষমতাটাও তার বেশী এটা যেন আমরা ভুলে না যাই। অবশ্য এটাও আমরা জানি যে যতই বাস্তবতার বড়াই কক--- সিনেমার পর্দায় আগুনের দৃশ্য দেখলে কেউ জলের বালতি নিয়ে আগুন নেভাতে যায় না। সবচেয়ে যেটা বড় ব্যাপার সেটা হচেছ ক্যামেরার চোখ বলতে যা বোঝায় সেটা আসলে ক্যামেরা যিনি চালাচেছন ছন্ত্রপ্সন্দ্বক্তপ্পুগ্ন তারই চোখ--- ব্দড়প্সব্ধ যিনি নির্দিষ্ট করে দিচেছন তারই দৃষ্টিভঙ্গী। তাই ক্যামেরার চোখ যতই শক্তিশালী এবং সুদূরপ্রসারী হোক না কেন--- মানুষের মনের গহনে ডুব দিতে গেলে সৃষ্টিকর্তার দেখা এবং দেখানোর ক্ষমতাটাই প্রধান বিচার্য হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে জীবনের জটিলতা প্রকাশ করতে অথবা ঘটনার অন্তর্নিহিত

সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে সিনেমা থিয়েটারের চেয়ে অনেকগুণ শক্তিশালী এটা প্রমাণ করা খুবই মুস্কিল! সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রেও সিনেমা বেশী সক্ষম এমন কথাও প্রমাণ করা যায় না--- আবার অন্যদিকে যারা এমন একটা ধারণার সমর্থক যে, থিয়েটার দর্শকের কাছে অনেকবেশী কল্পনাশক্তি দাবী করে--- মানুষের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপিত করার ক্ষমতা তার অনেক বেশি--- সেটাও খানিকটা অবৈজ্ঞানিক দাবী হয়ে দাঁড়ায়। বহু বছরের অভিজ্ঞতায় থিয়েটার তার নিজস্ব চৌহদ্দীতে কতকগুলো স্তুপ্সন্ধ্বন্দ্বন্দ্ব কতগুলো ব্দব্ধস্তুপ্তন্দ্ব কে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে বলেই দর্শকদের পক্ষে সেগুলি বোঝা বা মেনে নেওয়া অনেক সহজ হয়।

আর একটা দিক ভাবার আছে। নাট্যকলা শিল্প হিসাবে যতই প্রাচীন হোক, নাটক অনেকদিন থেকেই সাহিত্যেরও একটা অঙ্গ। চিত্রনাট্য সেই অর্থে একটু স্বাতন্ত্র দাবী করতে পারে--- যদিও চিত্রনাট্যেরও সাহিত্য হয়ে উঠতে বাধা নেই (অনেক ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছেও) কিন্তু ছবি তোলার খসড়া হিসাবে প্রায় সংগীতের স্বরলিপির মতই চিত্রনাট্যকে ধরে নেওয়া যায়। তাহলে সাহিত্যের ওপর নির্ভরতাজনিত অভিযোগ থেকে সে স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি পায়---কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রেও তো এখন দাবী উঠছে যে 'ব্দন্দ্বপ্রব্ধ' -এর প্রয়োজনই নেই---শারীরক্রিয়া এবং অভিব্যক্তিই যদি অভিনেতার ভাবপ্রকাশের প্রধান অবলম্বন হয় তাহলে 'ব্দন্দ্বপ্রব্ধ' -এর ভূমিকা অথবা সাহিত্য হিসাবে পাঠযোগ্য হওয়ার দায় থেকে সে অনেকটা মুক্তি পায়।

এবার আসা যেতে পারে অভিনয় প্রসঙ্গে। এই নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই--- সিনেমার অভিনয় আর থিয়েটারের অভিনয়ের মধ্যে কতখানি তফাৎ এবং সেটা তফাৎটা পরিমাণগত না গুণগত এ নিয়েও বহু মত আছে---কিন্তু আমার মনে হয় এ-সম্পর্কেও কোন স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা বা দুটি মাধ্যমের অভিনয়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ভেদরেখা টেনে দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তবু অভিনয়কলার প্রয়োগে মাধ্যমের বিশিষ্টতা অনুযায়ী আপাতভাবে যে-যে তফাৎগুলো চোখে পড়ে এক - এক করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

সবচেয়ে জোর দিয়ে যেটা বলা হয়ে থাকে, সিনেমার অভিনয় হবে একেবারে স্বাভাবিকতার প্রতিরূপ---প্রায় দৈনন্দিন জীবনে কথা বলার মত--- যেহেতু কথা পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাইক্রোফোনের সাহায্য পাওয়া যায়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করতে ক্যামেরার লেন্স সদা তৎপর--- অতএব যেমনভাবে চান খুব নিচুগলায় অথবা ফিসফিস করেও কথা বলতে পারেন---ভুর সামান্য ওঠানামা---ঠোঁটের সামান্য কাঁপন---অথবা চিবুকের একটুখানি তিরতির করে ওঠাটাও ক্যামেরা ধরে রাখতে পারে এবং অনেক বড় করে পর্দায় দেখাতে পারে--- চোখের তারার প্রতিটি ভাবের সূক্ষ্মতম দ্যোতনাকেও সে খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারে। অর্থাৎ কিনা আঙ্গিক এবং বাচিক অভিনয়ের চেয়ে স্বাত্ত্বিক অভিনয়ের সুযোগটা এখানে অনেক বেশী। মঞ্চে যেহেতু শেষ সারির দর্শককে কথা শোনাতে হয় এবং একটি সাধারণ মাপের প্রেক্ষাগৃহেও মুখমণ্ডলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তি কখনই শেষ সারির দর্শকের চোখে ধরা পড়তে পারে না--- তাই আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের ওপর জোর পড়তে বাধ্য। এ কথা কিছুটা সত্যি হলেও ঘটনাটা হচ্ছে অভিনয়ের জাতবিচারে 'সাত্ত্বিক' একটি লক্ষণবিশেষ। 'সাত্ত্বিক' শব্দটার আক্ষরিক অর্থ যাই লোক না কেন --- সাত্ত্বিক অভিনয়টাই অভিনয়ের উচচতম পর্যায় এমন কথা মনে করার কোন কারণ নেই। মঞ্চে অভিনয়ের ক্ষেত্রে বাচনভঙ্গিতে যে বিশিষ্টতার প্রয়োজন হয় সেটা ঠিকমত রপ্ত করতে পারলে একজন ভাল অভিনেতা গলার স্বরকে যে পর্দাতেই বেঁধে রাখুন অথবা স্বরগ্রামের ওঠানামাতে যত বৈচিত্রই আনুন না কেন--- নাটকের মেজাজ এবং চরিত্রের রূপ অনুযায়ী দর্শকের কাছে সেটা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়--- সেটাই মঞ্চাভিনয়ের নিজস্ব ভঙ্গী। আর সেটাকরতে যদি তিনি ব্যর্থ হন--- মঞ্চাভিনেতা হিসাবে তিনি ব্যর্থ। মাইক্রোফোনের অথবা ক্যামেরার সাহায্য পাওয়া যায় বলে সিনেমাতে অভিনয়টা যে - সুরে বাঁধা হয় অভিব্যক্তি প্রকাশের যে ঢঙটি লক্ষ্য করা যায় সেটা ও কিন্তু এই মাধ্যমটির বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মঞ্চেও যখন বহুক্ষেত্রে মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয় তখন অভিনেতা সেই অনুযায়ী বাচনভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন--- এমনকি যে মঞ্চেব্রস্তুপ্সস্তুব্দব্ধনস্তুব্দ খুব ভাল সেখানে প্রক্ষেপণ হয় একরকম--- আর যে-মঞ্চে একটু জোরে না বললে শেষ অব্দি গলা পৌঁছাবে না---সেখানে অভিনেতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেটা উপলব্ধি করতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী তার অভিনয়কে কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারেন। হিসেবে হয়তো অনেক সময় ভুল হয়ে যায়---কিন্তু একজন অভিনেতা যখন অভিনয় করেন---তারঅভিনয়ের রূপটা ঠিক কিভাবে দর্শকের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে--অর্থাৎ তার শরীর গলা অঙ্গভঙ্গী সমেত দর্শকরা ঠিক কিভাবে তাকে নিচ্ছেন সেটা কল্পনা করে নিয়েই তিনি মঞ্চে অভিনয় করেন। অবশ্য থিয়েটারের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহের একটা নির্দিষ্ট মাপ থাকা

উচিত--- কারণ একই নাটক একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাগৃহে যে-ধারায় অভিনয় হয়, প্রযোজনার মেজাজ যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়---সেটা বড় মাপের হলে অথবা খোলা মাঠে বহু দর্শকের সামনে অভিনয় করতে হলে তার মেজাজটা পালটে যেতে বাধ্য--পরিস্থিতি অনুযায়ী অভিনয়ের রকমফের করেও সব সময় মূল নাটকেরমেজাজ অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না। সিনেমার অভিনয় একটু সূক্ষ্মমাপের হতে হবে এই যুক্তিটা ততক্ষণ অব্দি মেনে নেওয়া যায়---শব্দযন্ত্র ও ক্যামেরার সাহায্য পাওয়ার দণ অভিনেতাকে তদনুযায়ী মাপটাকে ঠিক করে নিতে হয়--- মাধ্যমটির বিশিষ্টতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হয়--- কিন্তু গভীরতম আবেগ অথবা সূক্ষ্মতম ভাব মঞ্চে প্রকাশ করা যাবেনা এটা নেহাতই ভুল ধারণা--- নাটকের মর্মবস্তু যদি জীবনধর্মী হয়--- চরিত্রের কাঠামোটা যদি বাস্তবঘেঁষা হয় তাহলে একজন দক্ষ অভিনেতা মঞ্চাভিনয়েৰ নিজস্ব আঙ্গিকেই সবরকম ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন--- ফিসফিস করেকথা না বলেও ওইভাবে কথা বলার মেজাজটা তৈরী করতে পারবেন--- নীচু স্বরে কথা না বলেও নিবিড়তম আবেগের কাজের নিভৃততম পরিবেশ তৈরি করতে পারবেন। কিন্তু একজন অভিনেতা যখন বুঝতে পারছেন গোটা পর্দা জুড়ে তার মুখের ছবি পড়বে এবং সংলাপ ছাড়া মুখের অভিব্যক্তি দিয়েই তাকে ভাবটিকে ফোটাতে হবে তখন নিশ্চয়ই তিনি অভিনয়কে সেই জায়গায় ন্তুপ্সন্তুন্দ্ধব্ধত্তুব্ধন্দ্ব করাবেন---একজন ত্বস্তুন্প্স অভিনেতা যেমন তাঁর অভিনয়ের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেন গলার কাজে---স্বরগ্রামের বৈচিত্রে। দেখানোর ক্ষেত্রে সিনেমায় যেটা বাড়তিসুবিধে---প্রয়োজন মত পরিবেশ থেকে মুক্ত করে--- আশপাশকে কাটছাঁট করে ক্যামেরা শুধু যেটা দেখাতে চাইছে তার ওপর দর্শকের চোখকে নিবদ্ধ করাতে পারে--- মঞ্চে যেহেতু পর্দা খুললেই গোটা দৃশ্য সবসময় চোখেরসামনে খোলা থাকে তাই মঞ্চে যারা থাকেন কথা থাক বা নাই থাক সবসময়ই তাদের অভিনয় এবং প্রতিত্রিয়ার প্রকাশ দেখাতে হয়---সিনেমাতে ইচ্ছে করলেই বাকি সকলকে বাদ দিয়ে শুধু যাকে দেখানোর দরকার অথবা কাউকেইনা দেখিয়ে একটা বস্তু অথবা প্রতীকের ওপর চোখকে আটকে রাখা যায়---কিন্তু মঞ্চেও আমরা নানান কায়দায় 'ন্তুপুঙ্গব্দন্দ্ব-ত্তুস্ক্ষ' করার চেষ্টা করি--- গোটা মঞ্চটাকে গুটিয়ে এনে একটা বিন্দুতে এনে ফেলতে পারি--- অন্তত প্রয়োজনবোধে চেষ্টা করি। পরিচালকের পরিকল্পনা এবং অভিনেতার দক্ষতা অনুযায়ী তার সফলতা ব্যর্থতা নির্ভর করে।

আরও একটা ধারণা চালু আছে (অনেক মঞ্চ-পরিচালকও এ ধারণা সমর্থন করেন) মঞ্চে নাকি ত্মত্তুব্দন্দ্ব বানীরবতা খুব একটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে না--- নাটকে যারা শুধু ঘটনার ঘনঘটা পছন্দ করেন তারা তো সবসময়ই ত্মত্তুব্দন্দ্ব এড়িয়ে চলেন---তাতে নাকি নাটক ঝুলে যায়---কিন্তু নীরবতা যেখানে প্রয়োজন, কি মঞ্চে কি পর্দায়, সেখানে নীরবতার সাহায্যেই সেটা ফোটাতে হবে---এবং দুটি মাধ্যমেই সেটা সমান কার্যকরী হতে পারে। 'জগন্নাথ'নাটকের বহু নীরব মুহূর্ত দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। 'দশচত্র' নাটকে শম্ভু মিত্রের একজায়গাকার নীরব অভিনয় যে-মুহূর্ত তৈরী করেছিল সেটা ভোলার নয়।

এবার আসা যাক অন্য একটি প্রসঙ্গে। মঞ্চে একটা সুবিধে (অথবা অসুবিধে) আছে। অভিনেতারা সরাসরিদর্শকদের সান্নিধ্য পান। যোগাযোগটা সরাসরি বলে বহুক্ষেত্রে অভিনেতা উদ্দীপিত হতে পারেন--অনুপ্রাণিত হতে পারেন (তার প্রয়োজন আছে কিনা সেটা অবশ্য বিবেচনার বিষয়)। ---সিনেমাতে সুযোগ ঠিক অমনভাবে পাওয়া যায় না। কয়েকজন সহশিল্পী কলাকুশলী ছাড়া আলাদাভাবে দর্শক যেখানে উপস্থিত থাকে না ছ্লন্বদন্ব্ধপ্সক্ত দু-একজন থাকতে পারেন---অথবা বহির্দৃশ্যগ্রহণের সময় জনতার ভীড়ও থাকতে পারে---কিন্তু তাদের ঠিক দর্শক বলা চলে না)---কিন্তু এই পথ ধরে যদি দুটি অভিনয় ধারার মধ্যে ভেদরেখা টানতে চাই--- তাহলে খুব ভুল হবে।

প্রথমতঃ ত্রব্ধত্রন্দপ্স্ত্রব্দসম্ভ সাহেব আমাদের শিখিয়েছেন (চক্তন্দ্বন্তুড়ব্ধ সাহেব আবার একেবারে উলটো পড়িয়েছেন) দর্শকের দিকটা মঞ্চের ন্দ্রপ্সত্ত্বক্তব্ধড় ভ্রূপুপ্ত --অর্থাৎ অন্ধকারে বসে থাকা দর্শকদের উপস্থিতিটা অভিনেতারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনবেন না, তার 'নন্দ্র' মায়ামন্ত্রে মঞ্চের পরিবেশটা হয়ে উঠবে জীবন্ত, চরিত্র হয়ে উঠবে জীবন্ত। পাশের লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় অভিনেতা পাশের লোকের সঙ্গেই কথা বলবেন; আত্মগত ভাবনার প্রকাশে আত্মগতই থাকবেন; দর্শকদের চোখযে তাদের দিকে নিবদ্ধ দর্শকদের মনোযোগ তাদের ওপর কেন্দ্রীভূত এটা পুরোপুরি ভুলে থেকেই তাকে অভিনয় করে যেতে হবে। অভিনেতার মনোযোগ যে তাকে নাটকের দৃশ্যগত পরিবেশ এবং চরিত্রের নিজস্ব অবস্থানে বেঁধে ফেলতে পারে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই এবং সব কিছুই ভুলে একেবারে আত্মগত হয়ে অভিনয় করার মুহূর্ত কখনওসখনও প্রায় সব অভিনেতার ভাগ্যেই ঘটে, কিন্তু এটা সর্বক্ষনের জন্য অভিনেতার মাপকাঠি হতেই পারে না,

অভিজ্ঞতাও সেকথা বলে না। কাঠ - কাপড়ে তৈরী বস্তীর দৃশ্যে মঞ্চটাকে সত্যিকারের বস্তী মনে করা এবং খোঁচা দাড়ি--
ছেঁড়া - পাজামা পরা নিজেকে এখন সত্যিকারের বস্তী অধিবাসী মনে করা, মঞ্চে দর্শকদের অস্তিত্ব এবং নিজের অস্তিত্বের
কথা ভুলে গিয়ে অভিনয় করার ব্যাপারটাই আমার কাছে প্রায় অসম্ভব একটা প্রক্রিয়া এবং প্রায় - অবৈজ্ঞানিক একটা প্রস্ত
াব বলে মনে হয়। কারণ এটা তো ঘটনাই যে, যতই চরিত্রের ভিতর ডুবে থাকা যাক্ না কেমন মঞ্চের চৌহিদ্দীতে সমস্ত ভ
াবভঙ্গী--- চলাফেরা পূর্বপরিকল্পিত এবং সুনির্দিষ্ট ছকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে নিজস্ব সংলাপ ঠিকমত বলা এবং অন্য
চরিত্রের সংলাপের ‘কিউ’ মনে রাখাটা ভীষণভাবে জরী, আলোটাকে ঠিক জায়গায় ঠিক ভাবে নিতে হয়, সংগীতের সঙ্গে
তাল মিলিয়ে চলতে হয়----এছাড়া অভিনয় চলাকালীন দর্শকদের নিশ্বাস - প্রাসেরশব্দ, উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি, হাসির অ
াওয়াজ অথবা নিন্দাসূচক মন্তব্য অনেকসময়ই মঞ্চে এসে পৌঁছোয়, প্রতি মুহূর্তে ই দর্শকরা জানান দেন যে আমরা আছি-
--অভিনেতাও যতই ভাল কন না কেন তারও টনটনে জ্ঞান থাকে যে মুহূর্তে এই ত্রুঙ্কপ্তন্দ্ব’ -এ দাঁড়ালে
ন্তুপ্সপ্পন্মাপ্সব্দনব্ধনপ্সুটা এইরকম হবে---এই সংলাপটা এইভাবে ব্ধড়ভ্জপ্সভ্র করলে দর্শকদের কানে এইরকম লাগবে---
মহলা দিয়ে সমস্ত ছকটা তৈরী করে নিলেও অভিনয় রজনীতে অভিনেতাকে নতুন করে চরিত্রটির মুখোমুখি হতে হয়---
মঞ্চের পরিবেশের মাঝখানে নিজেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে হয়। আসলে ব্যাপারটা খুবজটিল--- চরিত্রের প্রতি---
ঘটনা ও দৃশ্যের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ না দিলে যেমন অভিনয়ের স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটতেপারে না--- আবার একেবারে
অস্তিত্ব বিলোপ হওয়ার মত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়---এই দুইয়ের মধ্যে যিনি ঠিকমত মেলবন্ধন ঘটাতে পারেন---
তিনিই সার্থক অভিনেতা---অভিনয়ের সময় সম্পূর্ণ সজাগ এবং আত্মসচেতন হয়েও তিনি দর্শকদের সামনে চরিত্রটিকে
একেবারে স্বাভাবিক এবং জীবন্ত ক’রে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। চজ্ঞন্দ্বন্তুড়ব্ধ সাহেব অবশ্য একেবারে ঘা মেরে এই ধারণাট
াকে ভাঙ্গতে চেয়েছেন এবং কোনরকম অস্পষ্টতার মধ্যে না গিয়ে দৃঢ়ভাবে দাবী জানিয়েছেন যে মঞ্চে অভিনেতাকে তো স
ম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকতেই হবে, এবং দর্শকদেরও সবসময় সচেতন রাখার চেষ্টা করতে হবে---কারোরই একথা ভোলার
প্রয়োজন নেই এটা অভিনয় হচ্ছে---একটা ঘটনার ‘রিপোর্টাজ’ হচ্ছে---একটা চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একজন অভিনেত
া দর্শদের সামনে পেশ করেছেন। আবার, অতি সাম্প্রতিককালে দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতার যোগাযোগটা নিবিড় করার
জন্যে অন্য অনেকরকম পরীক্ষা - নিরীক্ষাও চলছে ---দর্শকদের মাঝখানে অভিনয় ক’রে--- অভিনয়ের মধ্যে দর্শকদের
অংশগ্রহন করিয়ে এবং শারীরিক সান্নিধ্যের মাধ্যমেও দর্শক অভিনেতার যোগাযোগটা আরও ঘনিষ্ঠএবং নিবিড় করে তে
ালার চেষ্টা চলছে। মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতিটা হচ্ছে দর্শকরা অভিনয়-ক্রিয়ার সময় সশরীরে হাজির আছেন-
--যদি কেউ তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকারকরে আত্মগত অভিনয়ে নিমগ্ন থাকতে চান ভালো কথা, কিন্তু দর্শকরা থাকার ফলে
ব্যাপারটা যেমন সরাসরি এবংজীবন্ত হয় অন্যদিকে তাদেরকে বেশী গুত্ব দিলে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ার সম্ভাবন
াও থেকে যায়। অর্থাৎ কিনা দর্শকদের উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে অভিনেতা হয়ত নির্দিষ্ট ছকের বাইরে পা ব
াড়াতে প্রলোভিত হতে পারেন, তাতে হয়তো হাততালি জোটে কিন্তু প্রযোজনার কাঠামো থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবার
বিপদটা থেকে যায়। অন্যদিকে দর্শকদের নিত্তাপ মনোভাব তাকে নিৎসাহ করতে পারে এবং তাতেও চরিত্রের মূল অবস্থ
ানটা নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে। অবশ্য আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একজন দক্ষ অভিনেতাকে ওইভাবে প্রভাবিত করা মুস্কিল।

সিনেমাতে কি ঘটে দেখা যাক্ এবারে। যখন দৃশ্যগ্রহণ ছব্দড়প্সপ্সব্ধন্তব্ধপ্প হয় তখন সাধারণতঃ অভিনেতার সামনে থাকেন
পরিচালক, কলাকুশলীবৃন্দ এবং সহযোগী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। সরাসরিভাবে দর্শকদের সান্নিধ্য পাওয়া সেই
অভিনেতার ভাগ্যে ঘটে না। ফলে তার অভিনয় প্রক্রিয়া অন্যপথে নিয়ন্ত্রিত হয়। ---দর্শকদের প্রতিক্রিয়া কিহতে পারে সেটা
অভিনেতাকে আঁচ করে নিতে হয়। ---যখন তিনি ক্যামেরার সামনে অভিনয় করছেন তখন তাতে যেমন চিত্রনাট্যের দাবী,
পরিচালকের দাবী এবং চরিত্রের দাবী মেটাতে হচ্ছে তেমনি যে দর্শককূলের কাছে পর্দায় তিনি প্রতিফলিত হবেন তাদের
প্রতিক্রিয়াটা কিরকম হতে পারে সেটাও কল্পনা করে নেওয়া তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। নাটকের মহলাপর্বে মঞ্চাভিনেত
াদের ক্ষেত্রে খানিকটা এধরনের মনোভাব কাজ করে। তবে নাটকের ক্ষেত্রে যেটা বড় সুবিধে--- প্রথম অভিনয় রজনী অথব
া তারপরের আর কিছু অভিনয় রজনীতে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া--- সমালোচকদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে অভিনেতা
নতুন করে চিন্তা করার --- নিজেকে বদলে নেওয়ার সুযোগ পান---ফিল্মে সে সুযোগ নেই বললেই চলে। অভিনয় মনে
ামত না হলে পরিচালক একবারের জায়গায় দশবার ‘টেক’ করতে পারেন--- এবং যেটা সবচেয়ে মনোমত লাগবে

সেটিকে নির্বাচিত করতে পারেন--- কিন্তু 'ঋড়ঙ্গঙ্গৎঋন্তঙ্কং' -পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর কিংবা পর্দায় অভিনয় দেখার পর হাজার মাথা খুঁড়লেও তার বদল করা একেবারেই সম্ভব নয়। কিন্তু সুবিধের দিকেও একটা আছে বই কি। কয়েকটি 'টেক' - এর মধ্যে যে অভিনয়টি নির্বাচিত করা হোল সেটি বরাবরের জন্য গাঁথা হয়ে গেল---অভিনেতা চেষ্টা করলেও যেমন তার থেকে ভাল অভিনয় করতে পারবেন না---আবার তার থেকে খারাপ অভিনয় করাটাও তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। মঞ্চে এমন ঘটনা আকছার ঘটছে---পরিস্থিতি--- মন -মেজাজ অনুযায়ী রোজই একেবারে হুবহু---এক ধরনের অভিনয় করা সম্ভব হয় না--- কোনদিন হয়তো একটি দৃশ্যে খুব ভালো অভিনয় করলেন একজন---দর্শকদেরও পছন্দ হোল---অভিনেতা নিজেও সন্তুষ্টি ভোগ করলেন---কিন্তু সেইরকমটি অভিনয় যে তিনি প্রতি রজনীতে করতে পারবেন তার ষোল - আনা গ্যারান্টি নেই। হেরফের হতেইপারে। ---যদিও সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে সুনির্দিষ্ট ছকের অভিনয়ে---বুদ্ধিবাদী অভিনয়ের ক্ষেত্রে হেরফের হওয়ার কথা নয়, কিন্তু প্রতিটি অভিনেতা নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করবেন--- সত্যিকারের ভালো অভিনয়ের মুহূর্ত প্রতিদিন একইভাবে তৈরী করার ক্ষমতা পুরোপুরি হাতের মুঠোর মধ্যে থাকে না। ফিল্মের ক্ষেত্রে আর একটি বাড়তি সুবিধে হচ্ছে--- দৃশ্যগ্রহণের সময় একজন দর্শক অখণ্ড মনোযোগ নিয়ে তার অভিনয় দেখেন--- তিনি হচ্ছেন ছবির পরিচালক (নাটকেও পরিচালক থাকেন এবং তিনিও অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে অভিনয় দেখেন ---- কিন্তু যখন আসল কাজটি হয়, অর্থাৎ মঞ্চে অভিনয় হয় তখন অভিনেতাই সম্রাট--- ছকের ভেতরে থাকার বাধ্যবাধকতা থাকলেও অভিনয় চলাকালীন তার ওপর নির্ভর করতেই হয়)--- তাকে খুশী করা ছন্মঙ্গঙ্বদনন্ধল্লন্দ্ব অর্থে) এবং তার দাবী মেটানো অভিনেতার পরম প্রাপ্তি। ---আসলে অভিনেতার কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপিত করার জন্য দর্শকদের শারীরিক সান্নিধ্য খুব প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে না। উদ্দীপনা, অনুপ্রেরণা নিজের ভেতর থেকে অনুভব না করলে কয়েকডজনবোদ্ধা পরিচালক, অথবা কয়েক হাজার দর্শকও অভিনেতাকে উদ্দীপিত করতে পারবেন না। তবে কিছু পরিমাণে সাহায্য তারা করতে পারেন বৈকি। সেটা নির্ভর করে অভিনেতা---পরিচালকের বোঝাপড়ার ওপর, অভিনেতা - দর্শকের মানসিক তথা চিন্তাগত নৈকট্যের ওপর।

ফিল্মের ক্ষেত্রে অবশ্য এমনও বলা হয়ে থাকে যে ক্যামেরা তথা পরিচালক নাকি অনেক পরিমাণে বেশী ভূমিকা গ্রহণ করেন, ক্যামেরা নাকি নিজেই অনেকটা অভিনয় করে নিতে পারে। এখন ক্যামেরার এই অভিনয় করার ব্যাপারটা কিরকম? ধরা যাক কোন একটি দৃশ্যে পরিচালক বলছেন ঃ এটা স্তুপ্তঙ্গঙ্বদন্দ্ব-ত্তম্ম এ অর্থাৎ খুব কাছের থেকে নেব, তাই মুখমণ্ডলের বাড়তি অভিব্যক্তি করা চলবে না---ভুটা একটু কম তুলতে হবে---পর্দায় যখন মুখটা অনেক বড় দেখাবে, তখন ওই সামান্য ভু তোলাটাই অনেক বড় হয়ে দেখা যাবে এবং সেটাই কাম্য। অর্থাৎ কিনা ট্রঙ্গন্দ্বক্ক অভিনেতার ভু তোলার অভিজ্ঞতাটাকে স্থ্রঙ্কনন্দ্রস্ত করে দেখলো বলে সেও অভিনয়ে অংশ নিলো। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ওই একই ধরনের দৃশ্যে মঞ্চে যদি আরও বেশী করে ভু ওঠানোর প্রয়োজন হয়---অভিনেতা নিশ্চয়ই সেটা করবেন, পরিচালকও নিশ্চয়ই সেরকম আশা করবেন। এখন ফিল্মে মাঝখানে ক্যামেরা আছে বলে এবং লেন্সের তারতম্য অনুযায়ী এবং কাছে অথবা দূরের থেকে তোলার তারতম্য অনুযায়ী অভিনয়ের যে রকমফের ঘটছে সে-সম্পর্কও কিন্তু অভিনেতাকে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল থাকতে হচ্ছে--- অর্থাৎ ফিল্মের একজন দক্ষ অভিনেতা জানেন কতখানি ভু তুললে পর্দায় সেটা কেমন ভাবে প্রতিফলিত হবে, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ভু কম তোলাটাই তার অভিনয় - জ্ঞানের শর্ত। ক্যামেরার নিশ্চয়ই এমন ক্ষমতা নেই, যে - অভিনেতা ভু ওঠানামা করাতে পারেন না--- তার হয়ে ক্যামেরা নিজেই ভু উঠিয়ে দেয়? অর্থাৎ, অভিনেতা ভুও ওঠালেন না অথবা ঠোঁটও কাঁপালেন না ---- ক্যামেরা তার হয়ে ভাবপ্রকাশের ওই অভিব্যক্তিটুকু করে দিলো এমন তো কখনই সম্ভব নয়। পর্দায় অথবা মঞ্চে মাপের তফাৎ হতে পারে কিন্তু মূল কাজটা সবসময় অভিনেতাকেই করতে হয়--- কেউই তার হয়ে করে দিতে পারে না। 'এডিটিং' -এর বাহাদুরীতে অভিনয়ে বৈচিত্র আনা নিশ্চয়ই সম্ভব---এমনকি সেই যে বিখ্যাত উদাহরণ একজন অভিনেতার একই ধরনের অভিব্যক্তি ক্যামেরা ধরে রাখলে তারপর একবার আনন্দের কয়েকটি দৃশ্য দেখিয়ে মুখটি পর্দায় পড়তে মনে হোল যেন হাসছে আবার দুঃখজনক বা শোকাবহ কিছু দৃশ্য দেখিয়ে ওই একই মুখ পর্দায় পড়লে মনে হোল সে যেন কাঁদছে অথবা তার চোখ ছলছল করছে---এখানেও মূল কৃতিত্ব সম্বাদক অথবা পরিচালকের, ক্যামেরার নয়।

সিনেমাতে একটা বিশেষ ধরনের সুবিধে আছে বটে। হয়তো একটা ঘরে বসে দুজন কথা বলছেন--- ইচ্ছে করলে দুজনকে

একসঙ্গে দেখানো যায়--- আবার আলাদা করে দেখানো যায়--- যে কথা বলছে তাকেও আলাদা করে দেখানো যায়---
যে কথা শুনছে তাকেও আলাদা করে দেখানো যায়--- এমনকি কথাবার্তা চলাকালীন কাউকেই না দেখিয়ে ক্যামেরা
অন্যকোন বস্তুকেও নিবদ্ধ থাকতে পারে--- গোটা লোকটাকে দেখাতে পারে আবার শুধু তার মুখটুকু অথবা চোখটুকু দেখ
াতে পারে ---ক্যামেরার পক্ষে এটা খুবই সোজা কাজ। মঞ্চে যেহেতু পর্দা খুললেই গোটা মঞ্চটা চোখের সামনে উন্মুক্ত
হয়ে যায়---চরিত্রগুলি একই সাথে চোখের সামনে থেকে যায়---বিশেষ সময়ে অভিনেতার ওপর দৃষ্টি পড়লেও চারপাশট
া চোখের সামনে থাকে বলেই সিনেমার কায়দায় ওইভাবে আলাদা ক'রে গুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না ঠিকমতন---কিন্তু
মঞ্চেরও নিজস্ব কতগুলি কায়দা আছে, আলোর সাহায্যে তো অনেক কিছুই করা যায় বটেই---এছাড়া নানান কৌশলে অ
াকাকিক্ষত ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর, দর্শকদের মনোযোগকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আসলে যা চোখে পড়ে তাই আমরা
দেখি না বলেই মঞ্চের এই সুবিধেটুকু আছে--- ক্যামেরা যেমন দৃষ্টিকোণ বদলে দূরত্ব কমিয়ে বাড়িয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী
চিত্রকল্প হাজির করে মঞ্চের ক্ষমতা সেদিক থেকে সীমাবদ্ধ হলেও 'ঋড়ন্দ্বল্পঋজন্দ্ব' এর নিজস্ব বাস্তবতায় এমন অনেক সুযে
াগ--সুবিধে আছে যাতে বুদ্ধিমান পরিচালক তার ইচ্ছে অনুযায়ী দর্শকদের মনোযোগকে আকর্ষণ করতে পারেন। এমনকি
প্রতীকের ব্যবহারে ক্যামেরার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী হলেও মঞ্চের নিজস্ব রীতিতে প্রতীককে প্রতিষ্ঠা করা
সম্ভব---বস্তুকে গুত্বপূর্ণ করে তোলা সম্ভব। এমনকি অভিনেতার অভিনয়ক্ষমতার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে প্রয়ে
াগকৌশলে অনেক কিছুই করা সম্ভব।

'জগন্নাথ' নাটকে যখন জমিদার - তনয় পুরোহিত - কন্যাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় মন্দিরের পেছনে ---জগন্নাথ ছুটে
বেরিয়ে আসে ঘর থেকে --- নেপথ্য থেকে ভেসে আসে মেয়েটির ছটফটানি এবং পুষের কামনাজড়িত স্বরের অস্পষ্ট অ
াওয়াজ--- জগন্নাথ সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের চাতালে ওঠে--- তার যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি দেখেই আমরা নেপথ্যের ঘটনাটা
আঁচ করতে পারি এবং শেষে মেয়েটির আর্তধবনির সঙ্গে ঢাকের বাজনা বেজে ওঠে জগন্নাথহাঁড়িকাঠে মাথা রাখে। সমগ্র
দৃশ্যটির পরিকল্পনা এবং প্রয়োগে পরিচালকের সুচিন্তিত মনোভাব কাজ করছে--- শব্দের অনুষঙ্গ, সংগীত এবং অভিনেত
ার শারীরিক প্রতিক্রিয়ায় যে মুহূর্ত তৈরী হচ্ছে তাতে পরিচালকের ভূমিকাটাই সবচেয়ে বড়। তাই যখন বলা হয়ে থাকে
ফিল্মের একজন পরিচালক নাকি যে কোন অভিনেতাকে দিয়ে অনেক ভাল কাজ করিয়ে নিতে পারেন--- নিরেস অভিনেত
াও ভাল পরিচালকের হাতে পড়লে উৎরে যান এগুলো শিল্পমাধ্যমহিসাবে ফিল্মের অতিরিক্ত গুণপনা বলে মনে করার কে
ান যুক্তিসংগত কারণ দেখি না। দ্দনব্দত্রপ্তঋব্ধব্জন্তুব্ধনস্ফ টা বেশি বলেই অভিনেতার চেহারা ভাবভঙ্গীর ভূমিকাটা ফিল্মে স
বাভাবিকভাবেই বেশী----দৃশ্যগত পরিমণ্ডল অনেকসময় বাড়তি সাহায্য করে--- তাই 'ন্বন্তুভন্তুপ্তন্দ্ব বড়নন্দ্বন্দ্র -এ ডডন্দ্ব
ত্রনন্ত্র যখন একজন সাধারণ মানুষকে দিয়ে অসাধারণ অভিনয় করিয়ে নিতে পারেন, তখন দাণ হৈচৈ পড়ে যায়। এখানে প্র
হচ্ছে--- প্রথমতঃ ভাল পরিচালকের কাজ ভাল হবে এটাই স্বাভাবিক--- তা সে আনকোরা নতুন অভিনেতাকে দিয়েই হে
াক অথবা প্রতিষ্ঠিত পাকা অভিনেতাকে দিয়েই হোক; দ্বিতীয়তঃ যিনি ওই চরিত্রে অভিনয় করলেনসেটা তার প্রথম অভিনয়
হলেও অভিনয়ের ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতা না থাকলেও এমনটা তো হতে পারে--- ভাল অভিনয় করার গুণাবলী তার মধ্যে
ছিলোই---পরিচালক ঠিকমত তাকে ব্যবহার করেছেন---অবশ্য ওই ছবির পর তিনি অন্য কোন ছবিতে খুব দাণ অভিনয়
করেছেন এটা শোনা যায়নি--- সেক্ষেত্রে তার চেহারা এবং মেজাজ ওই ছবিতে দাণভাবে মানিয়ে গেছে বলেই তিনি
পেরেছেন। সত্যজিতবাবুর ছবিতে অভিনয়টা খুব জমে --- অনেক নতুন অভিনেতাকে দিয়ে তিনি দাণ কাজ করিয়ে নিতে প
ারেন এটা যেমন ঘটনা তেমনি সৌমিত্র চ্যাটার্জ্জী বা রবি ঘোষ এবং সন্তোষ দত্ত বা উৎপল দত্ত যে সত্যজিতবাবুর
পছন্দসই অভিনেতা ওটাও তো ঘটনা। অর্থাৎ ভাল অভিনেতার সাহায্য তাঁকেও নিতে হচ্ছে এবং সাদামাটা অভিনেত
াদের দিয়ে যে তিনি ভাল কাজ করাতে পারেন সেটা পরিচালক হিসাবে তার বিশেষ দক্ষতা---ফিল্মের নিজস্ব ক্ষমতা নয়
আবার সঙ্গে সঙ্গে ওটাও মনে রাখা প্রয়োজন ভাল চিত্রনাট্য ভাল চরিত্র ভাল সংলাপের গুণেও অনেক অভিনেতা উৎরে
যান, যার মূলেও পরিচালকের অবদানটা সবচেয়ে বেশী। জীবনঘেঁষা চরিত্র এবং যথার্থ শৈল্পিক মুহূর্ত অভিনেতাকে অনেক
বেশী সুযোগ দেয়। মঞ্চেও দেখা যায়--- ভাল নাটকের ভাল দৃশ্যে অভিনেতার দুর্বলতা কিছু ঢাকা পড়ে যায়--- আবার য
াকে বলা হয়ত্রন্ত্বব্ধড়প্সজ্ঞত্ত্বসন্ন্ব' চরিত্র --- তার জোরেই অনেকে বেরিয়ে যান---ফিল্মে অথবা মঞ্চে অভিনেতার দক্ষতা
আলাদা করে মাপ করা সহজ কাজ নয়--- সবকিছুর মধ্যেই এমনভাবে জড়িয়ে থাকে তার অভিনয়--- কার গুণে কার স

ার্থকতাসেটা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে।
এমন কথাও শোনা যায় যে ফিল্মের অভিনয় নাকি তুলনামূলকভাবে শক্ত--- কেননা ছোট - ছোট ব্দন্দ্বশুত্ত্বন্দ্ধন্তুন্দ্ব -এর কাটা কাটা দৃশ্যে অভিনয় করতে হয়--- অভিনয়েৰ স্তুঙ্গ্ক্ষুব্দ্ধন্দ্ভত্ত্বন্দ্ধম্ভ থাকে না---আগে মৃত্যুদৃশ্যে অভিনয় করে হয়তো পরে ফুলশয্যার রাতের দৃশ্য অভিনয় করতে হয়--- তাতে নাকি বিশেষ ধরনের দক্ষতা লাগে। দক্ষতাতো লাগবেই---দক্ষতা ছাড়া কিছুই হয় না---কিন্তু এটাও এমন বিশেষ ধরনের দক্ষতা নয় যে শুধু ফিল্মের অভিনেতারদেরই সেটা করায়ত্ত। ফিল্মে অভিনয়ের ক্ষেত্রে একধরনের তৎপরতার প্রয়োজন তো আছেই; দ্রুত অনুধাবন করার ক্ষমতা, সংলাপ মুখস্থ করে সঙ্গে সঙ্গে সেটা দৃশ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিকভাবে উপস্থাপিত করতে হয় বলেই একবার 'টেকিং' হয়ে গেলে অভিনয়টাকে ফের বদলে নেওয়ার সুযোগ নেই বলেই---খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে হয়--- দিনের পর দিন মহলা দিয়ে নাটক প্রস্তুত করার প্রক্রিয়ায় সেটা একেবারে আলাদা---কিন্তু ওই যে স্তুঙ্গ্ক্ষুব্দ্ধন্দ্ভত্ত্বন্দ্ধম্ভ-র কথা বলা হয় ওর কোন ভিত্তি নেই। কারণ মঞ্চেও যখন কেউ অভিনয় করেন ওই অর্থে কারও স্তুঙ্গ্ক্ষুব্দ্ধন্দ্ভত্ত্বন্দ্ধম্ভ থাকেনা--- প্রতিটি দৃশ্যে অথবা দৃশ্যের প্রতি মুহূর্তে অভিনেতা নিজেকে সেই বিশেষ দৃশ্য অথবা মুহূর্ত্তের জন্য তৈরী করেন---আবার একটা হয়ে গেলেই পরেরটা এসে যায়---দর্শকরা যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটা স্তুঙ্গ্ক্ষুব্দ্ধন্দ্ভত্ত্বন্দ্ধম্ভ খোঁজে বা পায়---অভিনেতার দৃষ্টিকোণ থেকে সে - ধরনের স্তুঙ্গ্ক্ষুব্দ্ধন্দ্ভত্ত্বন্দ্ধম্ভ খুঁজতে যাওয়া ঠিক নয়। কারণ দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে বিরতি থাকে--- তখন অভিনেতার স্তুঙ্গ্ক্ষুব্দ্ধন্দ্ভত্ত্বন্দ্ধম্ভ ব্জুন্দ্ব্রস হয়--- দ্বিতীয় দৃশ্যে অভিনয় করার সময় অভিনেতা কখনই চতুর্থ দৃশ্যের কথা ভাবতে পারেন না---আবার চতুর্থ দৃশ্যে অভিনয় করার সময় দ্বিতীয় দৃশ্যের কথা তার মন থেকে মুছে যায়--- মঞ্চে প্রতিমুহূর্ত্তে অভিনেতাকে এইভাবে ব্দড়ঙ্গব্দ্ধ-স্তুল্লন্দ্বন্দ্নক্ষ্ণ করে নিতে হয় এবং প্রতিটি 'ব্দড়ঙ্গব্দ্ধ' -এর জন্য অভিনেতাকে আলাদাভাবে তৈরী হতে হয়---দু'ঘন্টা-আড়াইঘন্টা টানা অভিনয় হচ্ছে বলে, এমন মনে করার কোন কারণই নেই---প্রথম দৃশ্যে মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ামাত্রই স্তুঙ্গ্ক্ষুব্দ্ধন্দ্ভত্ত্বন্দ্ধম্ভ-র জোরে অভিনেতা গড়গড় করে শেষ দৃশ্যে পৌঁছে যান। মহলার সময় এটা খুব ভাল করেই বোঝা যায়-- কারণ মহলাতে অনেক সময় ভেঙে টুকরো করে অভিনয় চলে---পরের দৃশ্য আগে এবং আগের দৃশ্য পরে মহলা করার ব্যাপারটা তো আকছারই হয়। তাই ফিল্মের কোন ব্যস্ত অভিনেতা যখন একটা ছবিতে ভালোমানুষ নায়কের ব্দড়ঙ্গঙ্গব্দ্ধন্দ্ন্দ্ধ সেরে একই দিনে আবার আর একটা ছবি খল নায়কের চরিত্রে অভিনয় করতে ছোটেন তখন তাকে বাহবা দিতে হলে এইজন্যই দেব যে তিনি খুব ক্ষমতাবান অভিনেতা---নানান ধরনের চরিত্রে অভিনয় করার পারদর্শিতা হয়েছে তাঁর--- কিন্তু একজন মঞ্চাভিনেতাএরকমটি পারবেন না এ-ধরনের সিদ্ধান্তে যাওয়া নেহাতই ভুল ভাবনার পরিচায়ক। কারণ মুহূর্মুহূ নিজেকে বদলে নেওয়াটাই অভিনেতার ক্ষমতার মাপকাঠি--- একই রাতে একধরনের চরিত্রে অভিনয় ক'রে --- পরে অন্য ধরনের চরিত্রে সফল অভিনয় করার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। যিনি পারেন---তিনি দুটোই পারেন। অনেকসময় যে মঞ্চের বিখ্যাতঅভিনেতারা ফিল্মে ভাল কাজ দেখাতে পারেন না---তার জন্য দায়ী মুলতঃ দুর্বল চিত্রনাট্য এবং অযোগ্য পরিচালক। নতুন মাধ্যমটি সম্পর্কে ভাল ভাবে অবহিত হয়ে তবে অভিনয় করার দায়িত্ব যেমন অভিনেতার নিজের, একজন শক্তিশালী অভিনেতাকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে গেলে যে পরিচালকেরও অতিরিক্ত ক্ষমতার দরকার পড়ে সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই। মঞ্চে যিনি চিরটাকাল পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক নাটকে ভাবাবেগপূর্ণ অভিনয়ের অথবা বীররসের প্রকাশ দক্ষতা দেখিয়ে এলেন তাঁকে হুট্ করে একেবারে অন্য মাধ্যমে একেবারে অন্য ধরনের চরিত্রে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে গেলে কিছুটা কাঠখড় পোড়ানোর দরকার পড়ে বইকি। বড়ো মাপের আবেগ প্রকাশে যিনিসিদ্ধহস্ত তাকে ক্যামেরার ফ্রেমে বাঁধতে হলে--- স্বাভাবিকতার সীমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে পরিচালক এবং অভিনেতা দু'তরফেই ভালরকম বোঝাপড়ার প্রয়োজন আছে। স্বদেশে - বিদেশে বহু প্রখ্যাত মঞ্চ - অভিনেতা ফিল্মে সমানদক্ষতার অভিনয় করতে পারেন এমন দৃষ্টান্তের তো অভাব নেই। দুটি মাধ্যমেই তারা সমান স্বচ্ছন্দ এবং মানানসই। নাট্য - পরিচালনা এবং চলচিচত্র - পরিচালনা, দুটি কাজই সমান দক্ষতায় সারতে পারেন, এমন ব্যক্তিরও অভাব নেই।
কি মঞ্চে---কি ফিল্মে পরিচালকই শেষ কথা। তিনি যেমন নিজের মাধ্যমটিকে ভেঙ্গেচুরে নতুন করে সৃষ্টি করতে পারেন, আবার অন্য মাধ্যম থেকে মালমশলা সংগ্রহ করেও কাজ হাসিল করতে পারেন। তার দক্ষতা, তার কল্পনাশক্তি এবং মাধ্যমের ওপর তার দখল সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে, শিল্প সম্পর্কে নতুন সংজ্ঞার দাবী জানায়, এবং নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে।

মুভি মন্তাজ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮০

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com